বি শে ষ বি দ্যা সা গ র সং খ্যা

প্রথম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা • সেপ্টেম্বর ২০২০

রোদ্দুর

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার শিশু-কিশোরদের ত্রিমাসিক দেয়াল পত্রিকা। উষারডিহি, বুড়িঝোর, ভুতাম, শিউলিবাড়ি ও রুগরুঘুটু গ্রাম থেকে একযোগে প্রকাশিত।
সম্পাদকঃ ভাস্বতী রায় ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিংহপুরুষ

অরিন্দম গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নাম শুনলেই মাথা নিচু হয়ে আসে তাঁর পায়ের কাছে। তাঁর জীবনই এক মহান শিক্ষা। তাঁর লেখাপড়া, তাঁর কাজ, তাঁর পড়ানো, গরীব মানুষদের বুকে টেনে নেওয়া, তাঁর অদম্য জেদ, আত্মসম্মানবোধ, মেয়েদের শিক্ষার জন্য তাঁর চেষ্টা, বিধবা বিয়ে, স্কুল-কলেজ স্থাপনা, মানুষের বিপদে তাঁর আন্তরিক সাহায্য– সবকিছু আজব গল্প হয়ে আছে যা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। এমনই কিছু গল্প বলব আজ এখানে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন বরাবরই ছোটখাটো মানুষ। রোগা, ওজন কম। গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে কবাডি খেলতে গিয়ে তাঁকে হেনস্থা হতে হতো। দশাসই চেহারার গদাধর তাঁকে খপ করে ধরে ফেলত, ঠিক যেমন করে ভালু মাছ ধরে। বিদ্যাসাগর লাঠিখেলা ও ব্যায়াম শুরু করলেন গদাধরের সাথে লড়ে যাবেন বলে। কয়েক মাস কঠিন অনুশীলনের পর আবার কবাডি খেলতে নামলেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল, বেঁটেখাটো বিদ্যাসাগর কেমন অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর গদাধরকে মাটিতে চেপে ধরেছে। গদাধরের দর্প চুর্ণ করে বিদ্যাসাগরের দল জিতে গেল।

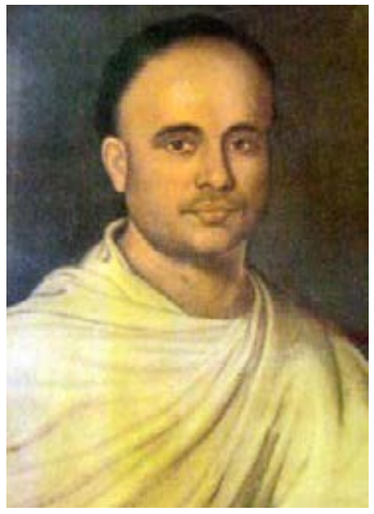

কলকাতায় পড়তে এলে বিদ্যাসাগরের সহপাঠীরা তাঁকে ‘কশুরে জৈ’ বলে খ্যাপাতো। তাঁর মাথাটা প্রকাণ্ড আর শরীর রোগা– দেখতে অনেকটা যশোরের কইমাছের মতো। যশুরে কৈ থেকে উল্টে গিয়ে কশুরে জৈ! বিদ্যাসাগর খেপে গিয়ে ঠিক করলেন, লেখাপড়ায় এদের পেছনে ফেলে দিয়ে সম্মান আদায় করে নিতে হবে। অনেক রাত অবধি তিনি পড়াশোনা করতে লাগলেন। তাঁর ভয়ানক খাটালি। বাজার, রান্না, বাসন-মাজা, জামাকাপড় কাচা— সব করতেন একা হাতে। তাঁর পড়ার সময় গভীর রাত। অদম্য ইচ্ছাশক্তি তাঁকে বিরাট সাফল্য এনে দিল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ‘কশুরে জৈ’ ফার্স্ট হল। তারপর থেকে সহপাঠীরা তাঁকে সমীহ করে চলত। বিদ্যাসাগর জলপানি পেলেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি গরীব সহপাঠীদের বইখাতা, জামাকাপড় কিনে দিতেন। তাঁকে পড়ুয়ারা তো বটেই, শিক্ষকরাও মান্য করতে লাগলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়ে উঠলেন ‘A lad of honour.’

বিদ্যালয়ের পাঠ তাঁর দু'তিন মাসের মধ্যেই পড়া হয়ে যেত। তিনি মনস্থির করলেন, খুব পড়াশোনা করবেন। জলপানির টাকায় তিনি কলেজ স্ট্রীট থেকে দেশ-বিদেশের বই কিনে আনতেন। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত– তিন ভাষাতেই দক্ষতা অর্জন করে ফেললেন। দিনের বেলায় তাঁর পড়ার সময় হয় না। তাই রাত জেগে চলত তাঁর পড়াশোনা। শিক্ষনীয় নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ– সাহিত্য, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সমাজনীতি! এতএত বিষয়, অথচ রাতে সময় মাত্র সাত-আট ঘন্টা। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে, মনোযোগ নড়ে যায়। তিনি এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রদীপের গরম তেল দু'চোখে মাখিয়ে দিলে ঘুম ছুটে যায়। কিছুক্ষণ অসহ্য যন্ত্রণা হয় বটে, তবুও তিনি তাই করতেন। এইভাবে ভোররাত অবধি তাঁর লেখাপড়া চলত। এই সাধনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল, অভূতপূর্ব! বিদ্যাসাগরকে সকলে বলত দয়ার সাগর। মানুষের দুঃখে তাঁর হৃদয় কাঁদত। একবার কলকাতা থেকে মায়ের জন্য লেপ পাঠিয়েছিলেন। মা ভগবতী দেবী সে লেপ গায়ে দিলেন না। ছেলেকে তিনি লোক মারফত জানালেন, গাঁয়ের অনেক মানুষের লেপ কেনার পয়সা নেই। তারা শীতে কষ্ট পাচ্ছে। তাই ঐ লেপ তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না। বিদ্যাসাগর তক্ষুনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন এবং গাঁয়ের গরীব মানুষদের জন্য লেপ কেনা হল। মন্বন্তরের সময় বিদ্যাসাগর গরীবদের খাবার বিলোতেন। নিজের গ্রামে তিনি খুলে ফেললেন অন্নসত্র। চার-পাঁচ মাস ধরে তিনি শরণার্থীদের অন্ন-বস্ত্র জুগিয়ে গেলেন। শুধু কি তাই! বুড়ো মানুষদের তিনি তেল মাখিয়ে দিতেন, শিশুদের সাথে খেলতেন, কিশোর-কিশোরীদের পড়াতেন।

শেষ জীবনে তিনি কর্মাটাড়ে চলে গিয়েছিলেন। সাঁওতাল গ্রামে তাদের সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটাতেন। তাদের জন্য স্কুল খুললেন। সরল মানুষগুলো তাঁকে নিজের বাবা মনে করত। তাঁর জন্য তারা ক্ষেতের ফসল, ডিম, মুরগি, মাছ নিয়ে আসত। বিদ্যাসাগরও তাদের রোগেভোগে চিকিৎসা করতেন, ওষুধ দিতেন, নানান পরামর্শ দিতেন ও তাদের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করতেন।

পৃথিবীতে অনেক শিক্ষাবিদ জন্মেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর একজনই হয়। মাঝেমাঝে মনে হয়, উনি কোনও অবতার, যিনি মানুষকে শিখিয়েছিলেন, বিদ্যার্জন এবং আর্তসেবা– এই দু'টি হল জীবনের গায়ত্রীমন্ত্র। তাঁর প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, আত্মশক্তি ছিল গড়পড়তা মানুষের থেকে হাজার গুণ বেশি। এইজন্য রবিঠাকুর তাঁর নাম দিয়েছিলেন ‘সিংহপুরুষ’। সারা জীবন ধরে তিন অসংখ্য বই লিখেছেন। সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন। কয়েক ডজন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের রক্ষা করেছেন। তাঁর ছিল বৈদিক ঋষির জ্ঞান, মায়ের মতো কোমল হৃদয় এবং রাষ্ট্রবিপ্লবীর কলজে। তাঁর জন্মের ২০০ বছরে তাঁকে শতশত প্রণাম।

জেদি ছেলে

পরাজয়

একটি ছেলে দারুণ জেদি,
হার না মানা স্বভাব।
প্রতিভা তার আকাশভেদী
যতই থাকুক অভাব।

দিনে পড়ার পায় না সময়
রাত্রি জেগে পড়ে,
মনের মাঝে একটাই ভয়,
তেল ফুরালে পরে

নিভবে বাতি। অন্ধকারে
আর যাবে না পড়া।
তাকিয়ে দেখে পথের ধারে
দিব্যি আলোয় ভরা

ল্যাম্পপোস্টের নিচে। সেথা
বইখাতা সব নিয়ে,
ঘুমায় যখন কলকেতা,
সে পড়তে বসে গিয়ে।

আমাদের ঈশ্বর

অর্ধেন্দু শিকদার

ছোটবেলায় তোমরা যেমন দুরন্তপনা করো তেমনি ঈশ্বরও ছিল খুব দুরন্ত। তার বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক যা বলতেন ঈশ্বর তার উল্টোটা করে বসতো। লেখাপড়া করার অনেক ইচ্ছে থাকলেও সংসারে অভাবের কারণে তা ছোটবেলায় হয়ে উঠেনি, কিন্তু ঈশ্বরের জেদ আর আগ্রহ দেখে তাঁর বাবা তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। ঈশ্বরের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ, কোন একটা জিনিস দেখলে সে অনায়াসে সেটি শিখে ফেলত। ঠিক তোমরা যেমন কোন প্রজাপতিকে দেখে তার পাখার রঙ মনে রাখতে পারো বা কোন পাখিকে দেখে তার ডাক নকল করতে পারো। ঈশ্বরের বাবা ছিলেন তার জীবনের প্রথম শিক্ষক। একবার ঈশ্বর তাঁর বাবার সাথে কলকাতায় যাচ্ছিল। পথে যেতে যেতে রাস্তার ধারে যে মাইলফলকগুলো থাকে, মানে যার গায়ে বিভিন্ন সংখ্যা আর জায়গার নাম লেখা থাকে, সেগুলো গুনে গুনে ঈশ্বর যাচ্ছিল, ঠিক সে সময় ঈশ্বরের বাবা ক্লান্ত হয়ে বলে ফেলেন, “জানিনা আর কতটা পথ বাকি।” তখন ঈশ্বর বলে, “বাবা, এখনো পাঁচ ক্রোশ পথ বাকি।” বাবা অবাক হয়ে বলেন, “আচ্ছা! তুমি কি করে জানলে?” ঈশ্বর বলে, “রাস্তায় আসার সময় ফলকের গায়ে লেখা সংখ্যাগুলো গুনে গুনে আসছিলাম।” শুনে ঈশ্বরের বাবার বুক গর্বে ভরে ওঠে। তিনি ঠিক করেন, যতই কষ্ট হোক তাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতেই হবে। তাকে নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে যান।

পড়াশোনার পাশাপাশি ঈশ্বর তাঁর বাবার সাথে বাড়ির অন্যান্য কাজেও হাত লাগাত। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর রাত জেগে পড়াশোনা করত। ঈশ্বরের জেদ আর শিক্ষার প্রতি আগ্রহই তাকে আমাদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর করে তুলেছে। আমাদের জন্য তিনি রচনা করে গেছেন বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী, নীতিবোধ ইত্যাদি নানান শিক্ষামূলক বই। তিনি হয়ে উঠেছিলেন সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত। পাশাপাশি ছিলেন একজন মহান সমাজসংস্কারক। তোমারা জানো কারা তাঁকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দিয়েছিলেন? দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র যে কলেজে পড়াতেন সেই সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তি। আর আমাদের মধুকবি মানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁকে ‘দয়ার সাগর’ এবং তাঁর মা ভগবতী দেবী তাঁকে ‘দানের সাগর’ উপাধি দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন পরোপকারী। গরীব দুঃখী মানুষদের কাছে তিনি ছিলেন সত্যিই ঈশ্বর বা ভগবানের মতো। তিনি ঠিক তোমাদের মতোই তাঁর মা কে খুব ভালোবাসতেন। মায়ের কথা কখনো অমান্য করতেন না। যারা মা কে ভালোবাসে, পৃথিবীর সবাই তাকে ভালোবাসে। তাই মা বাবাকে কখনো কষ্ট দিতে নেই। যদি তোমরাও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সবাইকে ভালোবাসতে শেখো, সাহায্য করতে শেখো, মানুষের দুঃখে পাশে দাঁড়াতে পারো, তাহলে দেখবে তাঁর মতো তোমরাও একদিন অনেক অনেক বড়ো মানুষ হয়ে উঠবে।

বোধোদয় ২

বোধোদয়
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বুঝতে বুঝতে যেটা শিখি
বাপের শিখি মায়ের শিখি
পাহাড় নদির বনের শিখি
বইএর পাতায় পড়ে শিখি
বিপদ এলে সামলে শিখি
ভাল খারাপ বুঝতে শিখি
শেখাকে কাজে লাগাতে শিখি
সেটাই হল বোধ, যেন জাড়
কালের রোদ ।
সূর্য যেমন আকাশে উদয়
বোধও তেমন মনেতে উদয়
কাজ দেখলেই সাহস যোগায়
গান গায়: হবে জয়
তখন আমরা সবাই বুঝি,
হয়েছে বোধোদয় ।।

বন
সোনারাম মূর্মু
রুগরুঘুটু, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া

–"হ্যাঁ ভাগনা, তুমি এতো দুঃখিত কেন?"
–"মামা, আর কি বলব, আমাদের অযোধ্যা পাহাড়ের বাসিন্দা মানুষ সবাই আমাকে কেটে উপড়ে, মেরে ফেলছে।"
–"ভাগনা, তাহলে কোন উপায় করতে হবে।"
–"আর কি উপায় পাব মামা!"

–"হ্যাঁ ভাগনা, আমি একটা উপায় করে দিব।"

–"মামা, বলো, কি উপায় করে দিবে। বলো মামা বলো।"

–"হ্যাঁ ভাগনা বলছি, যখন মানুষের কষ্ট হয় তখন কোন সাহায্য দিও না।"

–"মামা সে কেমন হবে?"

–"ভাগনা, অত ফুল ফল পাতা ওদের দিও না। আর আমিও নদী-নালা ঝর্ণার জল খুঁজে পেতে দিবো না।

লকডাউনে
সঞ্জয় কুমার মাহাতো (শিক্ষক)
ভূতাম, হুরা, পুরুলিয়া

ট্যাঁড় টিকরে ডুংরি পাহাড়, রুখা শুখা মাটি।
পুরুল্যার মানুষ হামরা, গতর লাগাই খাটি।

চাকরি বাকরি নাই হামদের, বাহার খাইটতে যায়।
লকডাউনে ঘরে বসে ; খাবার জুইটছে নাই।

বোম্বে,গোয়া,মহারাষ্ট্রে সারা বছর কাইট্যে।
সেখ্যান থ্যাকে টাকা পাঠায় শুধু লেবার খাইট্যে ।

দেশের দশের মন্ত্রী বাবু পায়ের উপর পা তুইল্যে
মাইক ফোনে জারি কইরল্য করোনা আসছে বইল্যে।

বন্ধ কইরল্য গাড়ি ঘোড়া, বন্ধ হইল্য কারখানা,
কাজ নাই কাম নাই, বাহির হত্যেও মানা।

মালিক কদিন খ্যাতে দিল, থাকলি তাস পিটে,
কদিন পরেই জবাব দিল্য,বাঁধলি গ্যাঁঠে-গিঁঠ্যে।

নিজের নিজের পয়সা দিয়ে কদিন চইলব্যেক আর,
ঘরের চিন্তা, বৌ বাচ্চা বুঢ়া মা-বাবার,

বিদেশ থেকে বাবুরা সব রোগ আইনল্য দেশে,
এখন হামদের মরন বাঁচন, থাইকত্যে হচ্ছে বইস্যে।

পেট চিপে থাইকব্য কদিন,থাইকব্য ভখের জ্বালায়।
দিন রাইত শুধু, ভাইব্যে ভাইব্যে সময় কাটে নাই।

গাঁয়ের যত ছেইলা ছকরা, সবাই আইল্য ঘরে।
হামদে ফুচুর জীবন গেল্য, রেইল লাইনের ধারে।

আমার উপর অনেক অত্যাচার করেছে।"

এভাবে অযোধ্যা পাহাড়ের মানুষ বিপদে পড়ে থাকে। বনের পশু, প্রাণী, বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, হরিণ, ময়ূর এদেরও অনেক রাগ।

মানুষ বলে: "বন্ধু, আমরা অনেক ভুল করে ফেলেছি। দেখো বন্ধু, আমরা আমাদের এলাকার গাছপালা নদী-নালা পাথর কেটে নষ্ট করে ফেলেছি। তাহলে বন্ধু এখন কি করা যায়?"

করার কিছু নেই। আর এখন সেই বনে দুঃখের হলো আমরা। আমাদেরকে ক্ষমা করার যোগ্য এখন কেউ নেই। হ্যাঁ বন্ধু আমরা। আমাদের অযোধ্যা বাসিন্দা মানুষের জন্য একবার ক্ষমা চাই। বনজঙ্গল নদী-নালা গাছপাথর এর কাছে ক্ষমা চাই।

মানুষ: "বাগমুন্ডি-পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর আমরা কেউ জঙ্গলমহলে গাছ কাটবো না। নইলে পাব না ক্ষমা। আমরা তো অযোধ্যা বাসিন্দা।" গাছ পাহাড় একবারের মত করে দিল ক্ষমা।

ভাদরিয়া ঝুমুর
রামকৃষ্ণ মাহাতো
শিউলিবাড়ি, কাশিপুর, পুরুলিয়া

ভাদর মাসে ভাপসা গরম
তালের পিঠা লরম লরম
আইস বন্ধু বস্য পাশের ঘরে
দুঃখের দিন পাইরায় গেছে, আর থাক্য না ডরে। রং।

ভত্তি বাঁধে হেলকে কাড়া
আইড় কলে ঘুঘি আড়া
চল অবকৈ সিনাই বহালে ঘুঘি ভরে
দুঃখের দিন পাইরায় গেছে, আর থাক্য না ডরে। রং।

কদ মাড়োয়া গুঁদলু ঘাঁটা
কাদা গোহালৈ খাড়াং ঝাঁটা
গরু ছাগল ডাঙায় ডাঙায় চরে, না ভখে মরে
দুঃখের দিন পাইরায় গেছে, আর থাক্য না ডরে। রং।

সকাল সন্ধ্যা ছৈলা কাঁদা
গরীব জনম ভাগ্য ছেঁদা
রাইত লুকায় খুখড়া ডাকে ভোরে
দুঃখের দিন পাইরায় গেছে, আর থাক্য না ডরে। রং।

করম গীত
রঞ্জিত মাহাতো
শিউলিবাড়ি, কাশিপুর, পুরুলিয়া

হেলকি ব মলকি ব জাওয়া পাতিব
শিউলিবাড়ির ডমের কাছে টুপা কিনিব।

নাচিব গাহিব জাওয়া পাতিব
দারকেশ্বরের লে বালি আনিব।

হাসিব খেলিব জাওয়া পাতিব
জনহার, কুখি, বিরির বীজ পুতিব।

ডাকিব হাকিব জাওয়া গাহিব
সাঁঝ হলে কুলহির মাঝে নাচ লাগাব।

সঙ্গীসাথি সবাই মিলে করম পরব করিব
মানভুমের সংস্কৃতিটাকে বাঁচাই রাখিব।

নাচিব গাহিব জাওয়া পাতিব
হামরা সবাই মিলে করম পরবে মাতিব।

এই পত্রিকা তোমাদের কেমন লাগল, তোমরা আর কি কি জানতে চাও, পড়তে চাও সব চিঠি লিখে আমাদের জানাও। চিঠি জমা দাও তোমাদের মাস্টারদের কাছে। তোমাদের ইচ্ছা জানতে পারলে আমরাও চেষ্টা করব পত্রিকাকে আরও সুন্দর করার।

আমাদের লেখা

তোমরা যারা এই পত্রিকা পড়ছ, তোমরাও লিখতে পার, ছবি আঁকতে পার এই পত্রিকার পাতায়। তোমাদের লেখা ছড়া, গল্প আর আঁকা ছবি জমা দাও তোমাদের মাস্টারদের কাছে। যাদের লেখা আর ছবি ভাল হবে, ছাপা হবে এই পত্রিকায়।

আমার দাদু আর দিদা
সবিতা হাঁসদা
ঊষারডিহি, ছাতনা, বাঁকুড়া

আমার দাদু দিদা খেত ভুট্টা, আখ খেত, আমার দাদু দিদা পুকুরের জল খেত। আমার দাদু দিদা খুব সুন্দর একটা গান করত। "হুটুর টুর বাজা বিয়ে লক্ষনা, তবে দিব শিয়াল চুপি চাখানা।" আমার দিদিমার গান খুব ভালো লাগত। আমাদের একটা গরুর গাড়ি ছিল। আমার দাদু গরুর গাড়িতে বউ নিয়ে এসেছিল।

আমাদের গ্রাম
অলকা হাঁসদা
ঊষারডিহি, ছাতনা, পুরুলিয়া

আমাদের গ্রামে কাঁচা রাস্তা ছিল। আর ফুটবল মাঠ ও আকাশবনির গাছ। আমাদের গ্রামের ঘরগুলোর ছাউনি খড় দিয়ে তৈরি। রাস্তার পাশে অনেক মহুল গাছ ছিল। আমার দাদু দিদা ও গ্রামের মানুষ মহুল ফল খেত। আমাদের গ্রামে একটা বট গাছ ও একটা কুয়া ছিল। সবাই কাজের থেকে ফিরে এসে জল খেয়ে গাছের তলায় বিশ্রাম করত।

পাহাড়ঘেরা গ্রাম
রামানন্দ সিং সর্দার
বুড়িঝোড়, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া

আমাদের ছোট্ট গ্রাম চারিদিকে পাহাড়বেষ্টিত সৌন্দর্যময় পরিবেশে গড়ে উঠেছে। এই সুন্দর গ্রামটি বুড়িঝোড়। এই বুড়িঝোড় গ্রাম আসলে একটি পাহাড়কেন্দ্রিক ছোট্ট প্রাকৃতিক পরিসর। এই গ্রামে রয়েছে রূপময় তিনটি ছোট্ট ঝর্ণা, এছাড়াও রয়েছে চারিদিকের পাহাড়, ঘন জঙ্গল, একটি ছোট নদী, অনেক চাষের জমি। কিছু গরীব আদিবাসী পরিবার বসবাস করে এই গ্রামে। তারা হল বিশেষ করে ভূমিজ, সাঁওতাল ও শবর। এই পরিবারগুলি বহুকাল থেকে এই পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বসবাস করছে। এছাড়াও এই গ্রামের পাশের পাহাড়ে রয়েছে বিভিন্ন হিংস্র পশু, বিষাক্ত সাপ, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়। আরও নানা সুন্দর পাখির বাসস্থান এই জঙ্গল। এই হল আমাদের গ্রামের অল্প কিছু কথা।

বন
সোনামনি মাঝি
ভূতাম, হুরা, পুরুলিয়া

বন আমরা খুব ভালোবাসি, আমাদের ঘরের পাশেই দুটি শালবন, আর একটি আকাশমনির বন আছে। আমার মা বাবা শালবনে যায় আর শালপাতা নিয়ে আসে। সেগুলো মা আর দিদি সেলাই করে, বিক্রি করে। আমি ও মা বাবার সাথে বনে যাই। সেখানে কত রকমের পাখি দেখি, আর পাথর কুড়াই। বনে কত রকমের ফুল। আমি ফুল তুলে ঘরে নিয়ে আসি আর বুনুর সাথে খেলা করি।

আমাদের ছোট নদী
সুমিতা হেমব্রম
বুরিঝোড়, বান্দোয়ান, পুরুলিয়া

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে। নদীটি দেখতে খুব সুন্দর। আমাদের এই ছোট নদীতে সবাই স্নান করে। গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুকিয়ে যায় এবং বর্ষাকালে নদীর জলে সব ভাসে। এই নদীতে ছেলেমেয়েরা স্নান করে ও সাঁতার কাটে। ছোট ছোট নৌকা ভাসে। এই নদীর জল অনেক মানুষই পান করে। কেউ সকালে স্নান করে এই নদীতে ও পুজোর জন্য জল নিয়ে যায়। কেউ কেউ মাছ ধরে। নদীর চারিদিকে কচি কচি সবুজ ঘাসে আর গাছপালায় ভরে আছে। চাষিরা এই নদীর জল নিয়ে চাষ করে। কেউ কেউ নদীর ধারে গাছের তলায় বসে একটু আরাম করে। এই নদীর জল খুব শীতল। তাই এই নদীর জল সবাই পান করে। এই নদী ছোট হলেও খুব গভীর। হাঁসগুলো নদীর জলে সাঁতার কাটে ও নদীর মাছ ধরে ধরে খায়। বক ও এই নদীর মাছ খায়। নদীর ধারে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে ও সেই ফুলের মধু মৌমাছিরা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এই ফুল দিয়ে পূজা হয়। নদীর ধারে নৌকো বাঁধা থাকে। হাঁস গুলো নদীর ধারে শ্যাওলায় ডিম পাড়ে ও ঢেকে রাখে।

কুইজ

কুইজ মানে প্রশ্ন আর উত্তরের খেলা। নানারকম মজার প্রশ্ন থাকবে এখানে। যারা ঠিক উত্তর দেবে তাদের নাম ছাপা হবে পরের সংখ্যায়।

১. প্রজাপতি তোমরা সবাই চেনো তো। বলো দেখি, প্রজাপতির ছানাদের কী বলে?

২. রঙ তার সবুজ, কিন্তু সে গাছ নয়। আমাদের নকল করতে পারে, কিন্তু সে বাঁদর নয়। তবে সে কী বলতে পার?

৩. আমরা জলের মধ্যে দম নিতে পারি না। তাহলে মাছ কীভাবে জলের মধ্যে বেঁচে থাকে?

৪. মৌমাছিরা কেমন ভোঁ ভোঁ শব্দ করে উড়ে বেড়ায় দেখেছ তো। বলো দেখি, ঐ রকম শব্দ ওরা কেমন করে করতে পারে?

৫. বাতাসের মত হালকা কোন জিনিস, যা আমরা যতই গায়ের জোর থাক, দু মিনিটও ধরে রাখতে পারি না?